



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 139 - 142

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পের কয়েকজন নারী : নারীর চোখে নারী

পিউ মুখার্জী

গ্রন্থাগারিক, শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ, কামারপুকুর, হুগলী

Email ID : piu.mukherjee3@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Shiksha-sanskriti,
Itihas, sakhi-samiti,
Mahila-shilpamela,
Atmasammanbodh,
Bir Hambir,
Rakshanshil,
Antahpurabasini,
Pardanoshin.

Abstract

The social status, personality, dignity, fight for self-respect and many other aspects of women are highlighted in the short stories of Swarnakumari Devi. In different stories, different women characters have become alive in such a way that the readers can feel them as in their everyday lives. In the stories the unbeatable, indomitable but soft and emotional hearts of the female characters are well exposed. These characters are beyond time and limit. The time the stories were composed showing the social status of the women of that time, claims to be innovative indeed. This essay discusses the efforts to express women's suppressed desire which is excellently depicted in the short stories of Swarnakumari Devi.

Discussion

উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের গভীর প্রভাব পড়েছিল ঠাকুরবাড়িতে, ঠাকুরবাড়ির পুরুষেরা এবং মেয়েরাও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে সমাজের অন্যান্যদের থেকে অনেক বেশি এগিয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবার, পারিবারিক রুচি ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার ভিত গড়ে রেখেছিল। অন্তঃপুর জীবনের অব্যবহিত সুযোগই স্বর্ণকুমারী দেবীর মনোলোকে সাহিত্য সৃষ্ণের অবকাশ রচিত করে দিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ইংরেজি গল্প তর্জমা করে ভ্রাতা ভগিনীদের শোনাতে তখন থেকেই স্বর্ণকুমারীর গল্প রচনার শুরু। ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব লাভের পর তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি ব্যাপকতা লাভ করে।

স্বর্ণকুমারীর কর্মজীবনে এবং সাহিত্যে মেয়েদের জন্য চিন্তা, উন্নতির ভাবনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কারণ মেয়েরা তখনও অনেক পিছিয়ে ছিল। শিক্ষা সংস্কৃতি কিছু ধনী পরিবারের মেয়েদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করলেও সমাজের বহু মেয়েই তখনও নানা কারণে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত ছিল। স্বর্ণকুমারী তাঁর কর্মজীবনে মেয়েদের উন্নতির চিন্তায় 'সখি সমিতি' নামে মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা, 'মহিলা শিল্প মেলা'র উদ্ভাবন ইত্যাদির পাশাপাশি সাহিত্যেও বিশেষ ভাবে বলেছেন মেয়েদের কথা। নারী সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি স্বর্ণকুমারী গল্পের বড় শক্তি। সমালোচকের ভাষায় - 'আগাগোড়া স্ত্রীলোকের সুর'। স্বর্ণকুমারী ছোটগল্পে আছে নারীমনের গোপন স্বরূপের ধীর উন্মোচন প্রয়াস, আছে মেয়েদের হৃদয়নিষিদ্ধ বেদনাবোধের প্রসারণ। তিনি তাঁর গল্পে পারিবারিক প্রেমিকা নারীদের কথার সঙ্গে মিশিয়েছেন সমাজকে এবং ইতিহাসকে।

সমাজে লাঞ্ছনাজনিত নারীদের বেদনার জগৎকে যেমন তিনি ঐক্যেছেন, তেমনি ইতিহাসের পটভূমিতে ইতিহাস রসে আবেগপ্রাণ হৃদয়বর্তী নারী সত্তাকে সিক্ত করেছেন।

‘মালতী’ গল্পে মালতী ও শোভনার হৃদয়বত্তার কাহিনী প্রধান হয়ে উঠেছে। মালতির প্রতি তার দাদার অকৃত্রিম ভালোবাসা ও স্নেহ বৌদি শোভনার মনে সন্দেহের বীজ বপন করে দেয়। প্রতিনিয়ত নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে হাঁপিয়ে ওঠে শোভনা। এই যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে সে বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। মালতির দাদা যখন জলে ঝাঁপ দিয়ে শোভনাকে বাঁচিয়ে আনে তখন শোভনার মন থেকে সকল সংশয় একেবারে দূরীভূত হয়। কিন্তু মালতি নিজেকে তাদের মধ্যে থেকে চিরতরে সরিয়ে নেয় সংশয়ের কোনোরূপ অবকাশ না রাখার জন্য। আত্মহত্যার করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে দাদা বৌদির সম্পর্ককে সুনিশ্চিত করতে চাওয়ার মধ্যে তার জটিল অথচ সুকুমার নারীসত্তার বিশেষ রূপটি প্রকাশ পায়।

‘কুমার ভীমসিংহ’ গল্পটি রাজপুত্র ইতিহাসের পটভূমিকায় লেখা। রানা রাজসিংহ, জ্যেষ্ঠপুত্র ভীমসিংহকে বাদ দিয়ে জয়সিংহের মাতার মনোরঞ্জননের জন্য জয়সিংহকে রাজা করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন ভীমসিংহের মাতা, রাজসিংহের অন্য মহিষী কমলকুমারী তাঁকে তাঁর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কমলকুমারীর স্বামীর অবহেলার জন্য যন্ত্রনা যেমন গল্পে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি তাঁর যুক্তি, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গি তাঁকে ব্যক্তিত্ব দান করেছে। স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিতা রমণী পুত্রের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছে।

‘কেন’ গল্পে রয়েছে স্বামীপ্রেম বঞ্চিতা এক রমণীর কথা। তার স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত। মাঝে মাঝেই বাড়ি আসেন না। স্বামীর অদর্শন মেয়েটির কাছে আরও যন্ত্রণাদায়ক। তার কথায়, -

“সংসারে স্বামীর ভালবাসা যাহার নাই, তাহার আবার কিসে সুখ?”^২

একদিন সে কালীঘাটে পূজা দিতে গিয়ে আর এক রমণীর সঙ্গে পরিচিত হয়। তার দাসীর মুখে মেয়েটির বঞ্চনার কথা শোনে রমণীটি এবং মেয়েটিকে সে আশ্বাস দেয় এই বলে যে মা কালী তাকে সুখী করবেন। মা কালীর কৃপায় পরদিন মেয়েটি তার সমস্ত গয়না ফিরে পায়, তার স্বামীও ফিরে আসে। তাঁর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে, তিনি এখন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে গৃহবাসী। মেয়েটি সুখী হলেও তাঁর মনে প্রশ্ন থেকে যায় - ‘কেন’। মেয়েটি প্রশ্নের উত্তর না পেলেও পাঠক অনায়াসেই বুঝতে পারেন যে, কালীঘাটের মন্দিরের সেই রমণীর ত্যাগের কারণেই মেয়েটি তাঁর সুখ ফিরে পেয়েছে, স্বামীর ভালোবাসা ফিরে পেয়েছে।

‘লজ্জাবতী’ গল্পে অভিমানী, একটুতেই লজ্জাবতী লতাটির মতো সংকুচিত, জড়সড় হয়ে পড়া মেয়েটির এই স্বভাবের কারণে তাঁর পিতা-মাতা নাম রেখেছিল লজ্জাবতী। তাঁর এই মধুর কোমল স্বভাব পিতা-মাতার মনে মাধুর্য সঞ্চার করলেও শ্বশুরগৃহে তাঁর এই অকৃত্রিম বিনয়-নম্রতাপ্রসূত শিশুসুলভ সরল লজ্জামাধুরী কখনো আদৃত হয় নি। তাঁর কোমল অশ্রুর অর্থ শ্বশুরবাড়ির লোক বোঝে নি। তাই যে স্বভাবের গুণে লজ্জাবতী পিতামাতার আদরের ছিল, সেই স্বভাবের জন্যই শ্বশুরগৃহে তাকে প্রতিপদে লাঞ্ছিত হতে হয়। শ্বাশুড়ি, জা, স্বামী এমনকি তাঁর সন্তান এবং দাসীরাও তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে তাকে বকাবকি করে, তাঁর দোষ খুঁজে বের করে। বহু বছর পর তাঁর নন্দ ফুলকুমারী যখন বাপের বাড়ি আসে তখন সে-ই কেবল বুঝতে পারে লজ্জাবতীর স্বভাবকে। একমাত্র ফুলকুমারীর কাছ থেকেই লজ্জাবতী যথার্থ স্নেহ ও ভালোবাসা লাভ করে। লজ্জাবতী অসুস্থ হয়েও জোর করে রান্নাঘরে গেলে ফুলকুমারী যখন তার ওপর রাগ করে, তখন তা তীব্রভাবে বিদ্ধ করে লজ্জাবতীকে। স্নেহ ভালোবাসার কাঙাল লজ্জাবতী তাই ফুলকুমারী তার ওপর রাগ করলে (যদিও তা লজ্জাবতীর অসুস্থতার জন্যই) তার হৃদয় ব্যথিত হয়। “...বেশ তুই রাঁধগে, সে রান্না কিন্তু আমি খাবো না।”^৩ শরীরের অসুস্থতার সঙ্গে মনের এই ব্যাথা তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

‘যমুনা’ গল্পটি সম্পর্কে লেখিকা জানিয়েছেন এটি সত্য ঘটনা থেকে গৃহীত। পিতৃহীন যমুনার বিবাহ হয় তাদের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া এক পথিকের সঙ্গে। যমুনার মায়ের মৃত্যুর পর যমুনা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যায়। যদিও তার স্বামীর তাকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সে জানতে পারে তার স্বামী পূর্বেই বিবাহিত এবং স্বামী জাতিতে বৈদ্য আর যমুনারা কায়স্থ। তাই যমুনার বিবাহ বিবাহই নয়। এই অসত্যকে যমুনা মেনে নিতে পারেনি। সে শ্বশুরবাড়ি

ত্যাগ করে। সেই সময় স্বামীর সঙ্গে তার দেখা হয়। স্বামী তাকে এখানে নিয়ে আসার অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চায়। কিন্তু মিথ্যা বলে তাকে বিবাহ করে স্বামী যে অন্যায় করেছেন সে সম্পর্কে তার কোনো অনুতাপ নেই। যমুনার সর্ব অঙ্গে যেন হু হু করে আগুন জ্বলে ওঠে। স্বামী তাকে স্পর্শ করতে গেলে সে বিদ্যুতের মতো সরে দাঁড়িয়ে গর্বিত, তীব্রস্বরে তাকে বাধা দিয়ে ভর্ৎসনা করে। স্বর্ণকুমারী যে যুগে বসে এই গল্প লিখেছেন সেই সময়ে একজন রমণীর স্বামীর প্রতি এই উক্তি তার তীব্র ব্যক্তিত্বের এবং আত্মমর্যাদার পরিচয়বাহী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য স্বর্ণকুমারী পিতামহী, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পত্নীর কথা। স্বামীর অনাচার নিজের চোখে দেখে এসে তিনি কাশীর পণ্ডিতদের কাছে বিধান চেয়েছিলেন যে এরূপ ব্যক্তির সঙ্গে একত্রবাস উচিত কিনা। স্বর্ণকুমারী পিতামহীর সেই ব্যক্তিত্ব যেন এখানে যমুনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যমুনাকে পরে আবার তার স্বামী এসে নিয়ে যায় কিন্তু যাবার আগে যমুনা তাকে দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নেয় যে তাকে তিনি অন্য গৃহে রাখবেন এবং তাকে পরস্পরী ভাবে দেখবেন। কিন্তু আরও একবার বঞ্চনার শিকার হয় যমুনা। তার স্বামী তাকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিতে চান। যমুনা আবার গৃহত্যাগ করে। এবার তার গৃহ হয় শ্মশান। মানুষের সংসারের অসত্য, অন্যায়, অধর্মের জীবনকে পরিত্যাগ করে সে শ্মশান কে তার ঘর করে নেয়। যমুনার আত্মসম্মানবোধ, ন্যায়-অন্যায়বোধের তীব্রতা, দৃঢ় মনোভাব সেযুগের পক্ষে অভিনব।

‘জীবন অভিনয়’ গল্পে মলিনার পুরুষের সহজলভ্য প্রেমের প্রতি বিরূপতা নারীমনের বিচিত্র অভিব্যক্তিতে দৃশ্য হয়েছে। মলিনার ‘মিসেস জনার্দন’ হতে বিশেষ আপত্তি। সেইস্থলে যদি অন্য কোনো সুললিত নামের সঙ্গে সে যুক্ত হতে পারতো ভালো হত। তার নামটি মলিনার যেকোনো বেসুরো বাদ্যযন্ত্রের থেকেও শ্রুতিকটু বলে মনে হয়। তাই জনার্দনকে সে কোনো ভাবেই ক্ষমা করে উঠতে পারে না। জনার্দনের ভালোবাসার আতিশয্যে সে যারপরনাই বিরক্ত।

“মলিনার কিন্তু জনার্দনকে ভাল লাগে না। জনার্দন সদাসর্বদা তাহার ভালবাসা দিয়া মলিনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চায় - ইহাতে তাহার অতিশয় বিরক্তি বোধ হয়।”^৪

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে খুব তুচ্ছ বিষয়ও কত বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা এই গল্পটিতে খুব সুচারুরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। মলিনা চরিত্রটির বৈচিত্র্য ধরা পরে তার রুচিশীল প্রতিক্রিয়াতে।

নারীহৃদয়ের সম্ভাব্য সকল বৈচিত্র্যকেই স্বর্ণকুমারী তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁর গল্পগুলিতে। সমাজের লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা রমণিচরিত্র আঁকার পাশাপাশি তিনি এঁকেছেন তেজস্বীনি, দৃঢ়চেতা, বলবান, আত্মসম্মমী নারীচরিত্রও। ‘ক্ষত্রিয় রমণী’ গল্পে এক গ্রাম্য ক্ষত্রিয় রমণীর তেজস্বীতার কাহিনীই উপজীব্য। এই নারীচরিত্রটির চিত্রণে লেখিকা এক অভিনবত্ব এনেছেন।^৫ রাজপুত্র বীর অরিসিংহ আকৃষ্ট হয়েছেন এক গ্রাম্য ক্ষত্রিয় রমণীর তেজস্বীতায়। ঘটনার বর্ণনা লেখিকার গল্প বলার ভঙ্গিমায় এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে এনে স্বর্ণকুমারী এই রমণী চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন সার্থকভাবেই। ইতিহাসের চরিত্র বীর হাঙ্গীর-এর পিতা মাতা অরিসিংহ ও এই ক্ষত্রিয় রমণী। ইতিহাস বলে, বীর হাঙ্গীরের পিতা অরিসিংহ প্রথানুযায়ী বিবাহ করেন এক প্রাণশক্তিতে ভরপুর, তেজস্বীনি, বীরাজনা এক গ্রাম্য ক্ষত্রিয় রমণীকে যার ফসল এই বীর হাঙ্গীর।

আরও এক সরলহৃদয় বালিকার হৃদয়ভঙ্গের গল্প শুনিয়েছেন স্বর্ণকুমারী তাঁর ‘গহনা’ গল্পে। ভাগ্যের পরিহাসে তার আশাভঙ্গের কাহিনীকে প্রতিপাদ্য করে স্বর্ণকুমারী দেবী এঁকেছেন নারীমনের আরেক পটচিত্র। বিহারীবাবুর পুত্র নলিন বিলেতে। বিহারীবাবুর স্ত্রী গত হলে শোকে মুহুমান বিহারীবাবু প্রতিবেশীর মেয়ে ভাবিনীকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন। ভাবিনীকে লালন পালন করতে করতেই বিহারীবাবু তাকে ভাবি পুত্রবধূরূপেও মনোনীত করে রাখলেন। সরলমনা, অপাপবিদ্ধা ভাবিনীও মনে মনে নলিনকে ভাবি স্বামীরূপে কল্পনা করে তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের কল্পনায় লজ্জিত ও পুলকিত হতে লাগলো। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত নলিন দেশে ফিরে জানিয়ে দিলো সে এই বিবাহ করতে পারবে না কারণ সে ইতিমধ্যেই বিবাহিত। ভাবিনীর কোমল সুকুমার নারীমন তীব্র যন্ত্রনায় ককিয়ে ওঠে যা পাঠকের চোখ এড়ায়না। এখানেও নারী মনস্তত্ত্বের বিচিত্র রূপটি ধরা পড়ে সুকৌশলী গল্প বলার ছলে। পাঠকের মন ব্যাথাভুর হয়ে ওঠে যখন ভাবি পুত্রবধূর জন্য রাখা বালাজোড়া ভাবিনীকে পরিয়ে দেবার জন্য বলা হয় নলিনকে। পাঠকের মনকে ছুঁয়ে যায় ভাবিনীর

মনোবেদনা। বিধাতার পরিহাসে কতশত ভাবিনীর কোমল সুকুমার মন ভাঙাগড়ার খেলায় আশাভঙ্গ হয় তা এই গল্পের পরিণতিতে সহজেই অনুমেয়।

“লেখিকার বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে যে ‘স্ত্রী-মনোভাবের নিখুত প্রতিবিম্ব’ পতিত হয়েছে তা সুধী সমালোচকের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে।”^৬

স্বর্ণকুমারী তাঁর অধিকাংশ গল্পে মেয়েদের কথাই বলেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা লজ্জাশীলা, কোমল, মাধুর্যময়ী, আপন মতামত প্রকাশে সংকুচিত। আবার কখনো তারা সুতীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রোজ্জ্বল। তবে স্বর্ণকুমারী নারীকে কিছুটা রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। অর্থাৎ তাঁর গল্পে নারীকে দেখা যায় ঘরোয়া ভঙ্গিতে, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে দেখা যায় না। সে ঘরের কোন থেকে বেরিয়ে আসা ঘোমটা-খসা নারী নয়, সমাজ সংসারের বেড়াডালে আবদ্ধ। মধ্যযুগীয় সংস্কারে বন্দী অন্তঃপুরবাসিনীদের লাঞ্ছনা, বঞ্চনার কথাই লেখিকা তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পগুলিতে। কারণ লেখিকা সে যুগের অন্তঃপুরবাসিনীদেরই একজন। যদিও বিবাহের পর তিনি স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূত্রে বাইরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তখনকার নারীদের বাইরে বেরোনোর সুযোগ ছিল কম। বাইরে বেরোতে হত পর্দাটানা হাঁপধরানো পালকি করে। তাদের অন্তরেও পর্দা, বাইরেও পর্দা। এই পর্দানশীন নারীজীবনের কথা তুলে ধরেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। নারীমনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যে রামধনু সৃষ্টি করে তার সফল রূপায়ন দৃশ্যমান স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পে। তিনি তাঁর নারীমনের সহৃদয়তা দ্বারা তাঁর ছোটগল্পের নারীচরিত্রগুলির চিত্রায়ন সম্পন্ন করেছেন।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি, n.d., পৃ. ২৮৮
২. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, স্বর্ণকুমারী দেবী, কলকাতা : অনুভব, ২০০০, পৃ. ২১৬
৩. সেন, অভিজিৎ, ভাদুড়ী, অনিন্দিতা (সংকলক), স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা-সংকলন, কলকাতা : দীপ প্রকাশন, ১৯৬০, পৃ. ৭১
৪. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, স্বর্ণকুমারী দেবী, কলকাতা : অনুভব, ২০০০, পৃ. ২০৮
৫. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, স্বর্ণকুমারী দেবী, কলকাতা : অনুভব, ২০০০, পৃ. ২১৩
৬. শাসমল, গুপ্তপতি, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা : বিশ্বভারতী, পৃ. ২৯৩

Bibliography:

- চট্টোপাধ্যায়, মীনা, স্বর্ণকুমারী দেবী, কলকাতা : অনুভব, ২০০০
- চৌধুরী, আধুনিক বাংলাসংস্কৃতি, সাহিত্যে মহিলা রচিত রচনার ক্রমবিকাশ, ১৮৫০-১৯০০, কলকাতা : বোনা, ২০০০
- দেবী, স্বর্ণকুমারী, স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা সংকলন, কলকাতা : দে'জ, ২০০০
- পাল, প্রশান্তকুমার, রবীজীবনী : ৩য় খন্ড ১২৯২-১৩০০, কলকাতা : আনন্দ, ১৩৯৪
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি, n.d.
- ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, স্বর্ণকুমারী দেবী : স্বতন্ত্র এক নারী, কলকাতা : পূর্বা, ২০০০
- ভট্টাচার্য, শোভারানী, মহিলা সম্পাদিত বাংলা সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকা (প্রাক স্বাধীনতা পর্ব), নদীয়া : শোভারানী ভট্টাচার্য, ২০০০
- শাসমল, গুপ্তপতি, স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা : বিশ্বভারতী, n.d.
- সেন, অভিজিৎ, ভাদুড়ী, অনিন্দিতা (সংকলক), স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা-সংকলন, কলকাতা : দীপ প্রকাশন, ১৯৬০